একালের ‘‘আখেটিক পালা’’

তাপসী বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্ভবত বছর তিরিশ আগে কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পশ্চিমবাংলার উত্তাল সময়তেই লিখেছিলেন এমন ক’টা লাইন ‘‘ফুরায় না ফুল্লরার বারমাস্যা/আর শূন্য হাতে কালকেতুর ফিরে আসা/ফুরায় না দু’টি অসহায় মানুষের/ক্ষুধায় জ্বলতে থাকা।/ ..... সারারাত তবু তারা স্বপ্ন দেখে/মাঠভর্তি ধানের আর বুকভর্তি ভালবাসার/আর স্বপ্ন দেখতে দেখতে কালকেতু রাজা হয়। / ফুল্লরার মুখে আবির লাগে।’’ আর তখন থেকেই বোধহয় সমাজকে ইতিহাসের নিচুতলা থেকে দেখার একটা প্রবণতা শু হয়েছিল সাহিত্যের শাখাপ্রশাখায়। বাংলা নাট্যচর্চাও সেই আওতার বাইরে থাকেনি। মধ্যযুগ নতুন প্রতীকী আখরে উঠে আসছিল নাটকের মধ্যে। পুরনো

লেকনাটকের ভাষা ধরা দিচ্ছিল নাট্যকলার প্রয়োগে। নতুন শতাব্দীর এই দু’তিনবছরে সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি-ভাবনায় উত্তর-আধুনিকতার বাতাবরণে যখন নিম্নবর্গীয় চেতনার ব্যবহার তর্কে-বিতর্কে’, মাজাঘষায় আরও শাণিত তখন ‘‘বহুরূপী’’ নাট্য সংস্থা তাঁদের সাম্প্রতিক প্রযোজনা ‘‘ফুল্লকেতুরপালা’’তে একটি মধ্যযুগীয় প্রচলিত উপাখ্যানকে ইতিহাসের সেই নিম্নভূমি থেকেই নতুন করে দেখাতে চেয়েছেন।

নাট্যকলার যেহেতু দুটো অংশ প্রধান—এক, নাটক আর দুই, অভিনয়রীতি; তাই প্রথমেই আসা যাক নাটকের আলোচনায়। ‘‘ফুল্লকেতুর পালা’’-র রচয়িতা দ্রপ্রসাদ চত্রবর্তী এবং নির্দেশক কুমার রায়। নাটকের বিত্রীত লিফলেটে বলা হয়েছে পালার মূল অবলম্বন মধ্যযুগের বাংলা লোকপুরাণের একটি গল্প। তবে খোলসা করে বলতে গেলে, এ নাটকের অনেক সংলাপ পর্যন্ত ষোড়শ শতাব্দীর কবি মুকুন্দ চত্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলের ‘আখেটিক খণ্ড’ থেকে প্রায় হুবহু বসানো। তবে অমিলের পাল্লাটাও বেশ ভারি। আসলে এ যুগের নাট্যকার একেবারে শিকড় ধরে টান দিয়েছেন তাই এ পালায় ব্যাধ কালকেতু-ফুল্লরা স্বর্গের নীলাম্বর-ছায়া নয়। এরা ‘খাঁটি’ মানবসন্তান। পালা অন্তে স্বর্গে ফেরার দায় এদের নেই। এরা ধরাধামে ‘সাম্যের স্বর্গ’ গড়ার স্বপ্ন দেখায়।

নাটকের নান্দীমুখ হয় শিবপার্বতীর ঝগড়া দিয়ে। তাঁরাই প্রকারান্তরে নাটকের সূত্রধর। গরীবের সংসারে শিবকর্তার নেশালাটি সরেস কিন্তু সখেদের জানান — ‘‘প্রথমে যে দিব পাতে তাই ঘরে নাই।’’ কবি মুকুন্দ অবশ্য এ সময়ে শিবকে ত্রিশূলটি বন্ধক দেবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের নতুন পালাকার শিবকে ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে চাষ করে অন্ন যোগানের নিদান দেন। দেবতা যখন ভূমিতে নামেন তখন মানুষের অন্যথা কি হয়? তাই গোধাসনা পর্ণশবরী দেবী অভয়া অরণ্যকুলকে রক্ষা করার জন্য আখেটিক (ব্যাধ) কালুবীরকে উড়িষ্যার কোল ঘেঁষে মেদিনীপুরের সীমান্তবর্তী কাঁসাই তীরে বন কেটে বসত ‘গুজার’ রাজ্যের রাজা করে দিলেন। (মধ্যযুগের কাব্যে অবশ্য এত নিখুঁত ভৌগোলিক অভিনিবেশ ধরা পড়েনি।) আর দেবী বলে দিলেন, হত্যার জীবিকা ছেড়ে কৃষিকাজ করে প্রজাপালন করতে। ব্যাস, দেবীর কাজ শেষ। দেবী গেলেন ঘুমোতে। কিন্তু রাজা-রানি হয়ে কালকেতু আর ফুল্লরা পড়ল দুই ভিন্ন ধরনের আতান্তরে।

কলিঙ্গ থেকে উৎখাত হওয়া চাষি বুলান মন্ডলের সাহায্যে কালকেতু ব্যাধগোষ্ঠীকে কৃষিজীবী করে তুলল। পুরনো সঙ্গী ন্যাড়া, শিবে, আতর আলি এরাই হল নতুন রাজার সেনাপতি, মন্ত্রী, সভাগায়ক। যদিও তারা মাঝেমধ্যেই ভুল করে পুরনো অভ্যাসে রাজাকে 'তুই-তোকারি' করে ফেলে। রাজা কালকেতুও আর নাচের আসরে বান্ধবী সুখদার কণ্ঠলগ্ন হতে পারে না। তার রাজ্যে গোলাভরা ধান আছে কিন্তু অস্ত্রাগার বা কারবার কোনওটাই নেই। সেনাপতির তরোয়ালটাও আধখানা। স্বভাবতই সামন্তপ্রভু কলিঙ্গরাজ ব্যাধনন্দের 'রাজা' হওয়াটা ভাল চোখে দেখে না। ইন্ধন জোগায় মধ্যসত্ত্বভোগী ভাঁড়ু দত্ত। আসলে দেবীর বরে কি সত্যিই 'রাজা' হওয়া যায়? রাজা হতে হয় লোকমান্যতায়। পিপীলিকার ডানা ছাঁটার তরে কলিঙ্গরাজ গুজার আক্রমণ করে। নিরস্ত্র রাজা বন্দী হয়। পুষেরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এগিয়ে আসে নারী বাহিনী — যার নেতা রাজারানির পুরনো সহচারী সুখদা। আবার দেবীর কাছে মানুষ কৃপাপ্রার্থী হয়। কিন্তু ঘুমকাতুরে দেবী কেবলই হাই তোলেন। তখন সুখদা দেবতার থেকে মুখ ফিরিয়ে শু করে লোকলক্ষ্মীকে জাগানোর সাধনা। লোক-সাধারণের সেই প্রাকৃত সংগ্রামে ব্যাধ কালকেতুর লোকমান্যতার রাজতিলক।

''ফুল্লকেতুর পালা'' কি তবে রাজার রাজত্বে সবাই রাজা হয়ে ওঠার গল্প? আসলে নাট্যকার বোধহয় এ পালায় চুপিচুপি হরেকরকম তত্ত্বকথার মিশেল দেবারই চেষ্টা করেছেন। যেমন, যে দেশে আণবিক নিরীক্ষায় বুদ্ধ হাসেন সেখানে অস্ত্রাগারের থেকে গোলাভরা ধানই বেশি দরকার। দ্বিতীয়ত, সেই গোলা ভরে ওঠে যাদের শ্রমে, তারাই রাজা নির্বাচনের আসল হকদার। তৃতীয়ত, নতুন সমাজের নিয়ন্তা শিব নন, অন্নপূর্ণা। পুষের সঙ্গে শুধু কাঁধ মিলিয়ে নয়, কখনও কখনও তাকে ছাপিয়ে নেতৃত্ব দেয় সুখদারা। তদুপরি রয়েছে 'দাও ফিরে সেই অরণ্য'-এর মতো বক্তব্য। তবে কোথাও তত্ত্বকথাই খুব উচচকিত হয়নি বলে রক্ষা পেয়েছে নাটকটা। রক্ষা যে পেয়েছে তাতে বোধহয় সন্দেহ নেই। একবার নাট্যকলা সংক্রান্ত আলোচনায় শম্ভু মিত্র বলেছিলেন, 'যাঁরা ছাপমারা বিদ্বান নন, তাঁরা অনেক ভালো নাটক বোঝেন। কেননা নাটকটা বুঝতে হবে নিজের বুদ্ধি দিয়ে। আর যাঁরা ঝিবিদ্যালয়ের ছাপমারা, তাঁদের পক্ষে নাটক বোঝা ভয়ানক শক্ত। এইসব লোকেরা নাটকটা সম্পর্কে কে কী বলেছে' ('কাকে বলে নাট্যকলা'-বই থেকে)। বর্তমান আলোচকের এ নাটকটি দু'বার দেখার অভিজ্ঞতা হয়েছে। দর্শকরা যে নাটকটা আদ্যন্ত উপভোগ করেছিলেন তা প্রতি পদেই উপলব্ধি করা গিয়েছিল। তত্ত্বের বাড়াবাড়ি থাকলে এটা সম্ভব হত না।

তবে প্রা উঠতে পারে এ তো ব্যাধ কালকেতুর রাজা হওয়ার নাটক। তবে কেন ''ফুল্লকেতুর পালা'' নাম? এ নাটকের কোথায় ফুল্লরা? আসলে ফুল্লরাই এ নাটকের বীজ। নাটকের মধ্যে থাকে যে মানুষ — সে বহুস্তরিক। সমাজের সঙ্গে, নিজের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ নিয়ে পুরো নাটকটা অনেকগুলো চরিত্রের গল্পের সমন্বয় হয়ে ওঠে। তাই কালকেতুর গল্প শেষ হয় না ফুল্লরা ছাড়া। ব্যাধ আর কৃষক,ব্যাধ আর রাজা, ফুল্লরার প্রেমিক কালুবীর আর রাজা কালকেতু — কালকেতুর এত রকমের দ্বন্দ্বকে উস্কানি দেয় যে ফুল্লরাই। সেই সঙ্গে রয়েছে তাঁর নিজের সংকট। রাজা হওয়ার পর ফুল্লরার সেই সরল কালুবীর, যে অঢেল ধন পেয়ে ফুল্লরাকে গোলাহাট থেকে তাবৎ দ্রব্য মায় বিটাবিটিও কিনে দেবার অঙ্গীকার করেছিল, সে ত্রমশ ফুল্লরার কাছে দূরের মানুষ হয়ে যায়। যে কালু পরম আদে ফুল্লরার কাছে নানা ব্যঞ্জন খেতে চাইত, আজ পুরনো অভ্যাসে ''কি রেঁধেছিস'' জিজ্ঞাসা করলেও রানি ফুল্লরার পক্ষে তার খোঁজ রাখার উপায় নেই। কালুকে সুখদার নাচের সঙ্গী দেখতে ফুল্লরা অভ্যস্ত ছিল। আজ রাজা কালকেতুকে নর্তকীর প্রতি অযাচিত সদয় হতে দেখে হিংসায় সে মত্ত প্রলাপ বকে। যে-সুখদা ছিল ফুল্লরার প্রাণের সখী, সেই সুখদার আনা নারকেল নাড়ু, সুগন্ধী তাম্বুল এ সব রানি ফুল্লরার পক্ষে সবার সামনে খাওয়া হয়ে ওঠে না। কালুবীরের ফুল্লরা 'ঘ্যাচাংফ্যাচাং'-এর অর্থ বোঝে না, বোঝে না খল ভাঁড়ুর শঠতা। ফুল্লরা অনেক কিছুই পারে না, সুখদার সঙ্গী হয়ে লোকলক্ষ্মীকে জাগাতেও পারে না। শেষ কালে সবার অগোচরে সুখদার কাছে নিজের অক্ষমতাকে উন্মোচিত করে। আসলে ফুল্লরার সংকট কেবল সামাজিক নয়, হয়ত অনেক বেশি ব্যক্তিক। তা আধুনিক নিঃসঙ্গ দ্বীপবাসী মানুষের। তাই নাটকের শেষদৃশ্যে রাজা কালকেতুকে নিয়ে যখন সমস্ত গুজার মেতে ওঠে — রাজা স্বয়ং প্রজাকে মাথার ওপর তুলে ধরেন, তখন সেই জনতার সঙ্গী হয়েও মুখে হাসি চোখে জল নিয়ে ফুল্লরা একটু পিছিয়ে পড়া — একটু যেন একা। আসলে আজকের অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামে তো নিজের বহুমাত্রিক

সত্তার নিরন্তর দ্বন্দ্বও যোগ হয়ে গেছে। সেই অভিযোজক প্রক্রিয়ায় আমরা কেউ কেউ এ ভাবেই পিছিয়ে পড়ি — আর রাজার সঙ্গী হবার অপেক্ষাতেও থাকি।

এবার বলা যাক অভিনয়কলা ও অন্যান্য প্রসঙ্গের কথা। আধুনিক মানুষের সমাজসত্তা আর ব্যক্তিসত্তার দ্বন্দ্বকে কালকেতু ফুল্লরার অ্যালিগরিতে গড়তে গিয়ে স্বাভাবিক কারণেই নির্দেশক বেছে নিয়েছেন মধ্যযুগীয় লোকনাট্যের নির্মিতি। শিবপ ার্বতীর পটের মুখোশপরে নাটকের শুতে 'আখড়াইবন্দী' পরিবেশন নতুনত্বের উপভোগ্যতা এনে দেয়। এ নাটকের সংলাপ ছন্দে ও গানে বাঁধা। গানেরপ্রয়োগ লোকসুরভিত্তিক উনিশ শতকীয় যাত্রার 'জুড়ির গান'-এর মতো। তবে নাচের কো রিওগ্রাফে সকলে সমান স্বচ্ছন্দ নন। সমস্ত মঞ্চকে সাবলীল মুনশিয়ানায় তিনটি স্তরে সাজানো হয়েছে। যার শেষভাগে রয়েছে জুড়ি-গায়েনের দল। দ্বিতীয় স্তরটি প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহারোপযোগী কয়েকটা থাম দিয়ে সাজানো। আর মঞ্চের সম্মুখভাগেই রয়েছে পথ থেকে রাজপ্রাসাদ।

চরিত্রচিত্রণে বহুরূপী মান অনুযায়ী সকলেই যথাযথ। তবে অমিয় হালদার ও সুধীন মুখোপাধ্যায়ের সংযত অভিনয় যথ াক্রমে ভাঁড়ু দত্ত ও মুরারী শীলকে নিতান্ত ভাঁড় হয়ে যেতে দেয়নি। গৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের অস্ত্রহীন সেনাপতির অসহ ায়টুকু ভারি ভাল। দেবীর ভূমিকায় কণিকা দে-র আাদিভঙ্গি দাণ অভিনব হয়েছে। সুমিতা বসুর সুখদা দার্ঢে ও লাস্যে ন াটকের অনেকখানি জুড়ে আছে।

যদিও এ পালায় কালকেতু ফুল্লরা সমান অংশী কিন্তু অভিনয়ে মঞ্চজুড়ে থেকেছেন একজন — কালকেতু দেবেশ র ায়চৌধুরী। দেবেশের সমস্ত চেহারা ও আচরণের থেকে যে আদিম অনার্য সরল মানুষটি বেরিয়ে এসেছে — তার সজীবত া প্রতিরোধহীন। কালকেতুর বীরত্ব, তার অবদ্ধ আবেগের যন্ত্রণা প্রকট হয়েছে অভিনেতার ছৌনাচের মতো সাবলীল দ াপুটে অঙ্গসঞ্চালনায়। কালকেতু-ফুল্লরার যুগল উপস্থাপনায় মাঝে মাঝেই যে কমিক আস্তরণ রয়েছে তা সহজেই মন ছুঁয়ে যায়। দেবেশের অভিনয়ের দাপট ফুল্লরার ভূমিকায় বয়ঃকনিষ্ঠ সুকৃতি লাহিড়ীর মধ্যে দেখা না গেলেও তার ঠোঁট ফোলানো অভিমান, অকারণ ঈর্ষায় কুঁকড়ে যাওয়া, নিজের সঙ্গে লড়াইয়ের কষ্ট, আনমনা একাকী ভঙ্গি কালকেতুর জ্বলে ওঠার পাশে নরম ধূপছায়া তৈরী করেছে। যেটার প্রয়োজন ছিল। ধ্রুপদী চর্চার নিত্যনতুন interpretation-এর নামে নিরন্তর চলেছে যে সাংস্কৃতিক দুর্বৃত্তায়ন, তার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়ভাবনা ও অভিনয়কলার সোনায় সোহাগায় এ ভাবেই জমে উঠেছে একালের ''আখেটিক পালা''।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com